হাসির গল্প

জব্দ

অনন্তদেব শর্মা



গোকুলমামা আমার আসল মামা নন। পাতানো সম্পর্ক। মামার আসল বাড়ি রঙিয়া অঞ্চলের শালখোয়া গাঁয়ে। ছেলেবেলায় অনাথ হন। আত্মীয়স্বজনরা সকলেও তাঁর কোনও যত্ন নেননি। মামা কিছুদিন আগাছার মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে জোয়ারের ঝাঁঝির মতো কীভাবে আমাদের ঘরে ঠাঁই পেয়ে গেলেন। বাবা তাঁকে আশ্রয় দিলেন। গাঁয়ের হাই স্কুলে তাঁর নাম লিখিয়ে দিলেন। তিনবার ফেল করার পর কোনওরকমে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করলেন। সে প্রায় আট-ন' বছর আগের কথা। গোকুলমামা ম্যাট্রিক পাশ করে হরিতলি গাঁয়ের পাঠশালায় শিক্ষক হয়ে ঢুকলেন। নিজের গাঁয়ে গিয়ে নড়বড়ে বাড়ি নতুন করে তুললেন। দু-তিন বছর পরে বিয়েও করলেন। এর মধ্যে ছেলেমেয়ে তিনটে। আমি কিন্তু মামার বাড়ি কোনওদিন

[illegible] ভট্টাচার্য



যাইনি। মা তাঁর বিয়ের সময় গিয়েছিলেন। সেজন্য দশ-বারোদিন থেকেও এসেছিলেন। মামা প্রথমে এসেই মাকে 'বড়দি' বলে ডেকেছিলেন। তারপরে তো কথাই নেই। সেই সূত্রে তিনি আমার মামা।

যদিও মামা নিজে বাড়ি করলেন তবুও তিনি আমাদের বাড়ির মায়া ছেড়ে যেতে পারেননি। এটাকে বলেন নিজের বাড়ি। মা-র বকুনি আর গালি না খেলে তাঁর ভাত হজমই হয় না। মা তাঁকে নিজের ছোট ভাই বলে ভাবতেন। পরম স্নেহ করতেন। তিনি একদিন ঘরে না এলে তাঁর ঘরে মন টিকত না। ছুটি পেলেই আমাদের বাড়ি আসেন। কখনওবা আট-দশদিন থেকে যান। ছুটি মানে, বছরের সাতমাস মামা নিজের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি করে কাটিয়ে দেন। ওপরওয়ালার হাতে ধরা পড়ে দু'বার তাঁর চাকরিও যায়-যায় হয়েছিল। কোনওমতে টিকে গেল। এই নিয়ে মামির সঙ্গে বাদানুবাদও হয় মামার। মামা নিজে একথা আমাকে শুনিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ এই মামা। মামির কথা নিয়ে একটুও রাগ করেননি।

মামা এলে আমাদের বাড়িতে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। আসার সময় মিষ্টি আর শাকসবজির বড় পুঁটলি একটা আনবেনই। তিনি এলে আমারও ভারী আনন্দ হয়। ছোঁ মেরে তাঁর হাতের মিষ্টির প্যাকেট কেড়ে আনি।

মোটের ওপর মামাকে পেয়ে আমি খুশিই হই। কিন্তু একটা কথার জন্য তাঁর ওপর আমার কখনওবা রাগ হয়, আবার কখনও হাসিও পায়! মামা তাঁর কোনও-কোনও কথা বড় বাড়িয়ে বলতেন, এক কথায় 'দম' দিয়ে ফুলিয়ে তুলতেন। একেবারে গাছে গোরু ওঠার মতো। একদিনের পরিচিত মানুষ হলে তো তাঁর সব কথা বিশ্বাস করে ফেলবে। বলার ধরনটা মামার ভাল। কথাগুলো এমন রং চড়িয়ে বলেন যে, সে-কথা সত্যি না ভেবে পারা যায় না।

একদিন কথায়-কথায় বাঘের কথা উঠল। মামা বললেন, "শুনছিস ঝুলন, বাঘ মারা আসলে কথার কথাই নয়। আমি একটা বাঘ সত্যিই মেরেছিলুম। সে প্রায় ন'-দশ বছর আগের কথা। তখন তুই একেবারে ছোট ছিলি। রাখাল দাস আর সুরেশ মেধি বাঘ মারবে বলে নেচে উঠল। শুনতে পেয়েছিল বনগাঁ অঞ্চলে একটা বাঘ বড় উৎপাত করছে। কয়েকটা গোরু-ছাগল নিয়ে গেছে। নিত্যই নতুন-নতুন উৎপাত চালাচ্ছে। গাঁয়ের মানুষ মনে-মনে বড় ভয়ে আছে। একদিন একটা মানুষকে ঘায়েল করেছে। এ-কথা শুনে বড়দি আর ভিনদেবকে (আমার মা আর বাবা) না বলে আমরা তিনজন বাঘ মারব বলে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড ঝোপ দেখলেই বুকের মধ্যে ধান ভানতে থাকে। তাতে গোটা রাত পাহারা দিয়ে থেকে শেষ রাতে বাঘটাকে খতম করলুম। সে প্রকাণ্ড এক বাঘ। দেখলে তোর পিলে ফেটে যেত।"

অল্প হেসে আমি বললুম, "আমার পিলে ফেটে যেত! তা হলে তো আমার বড় ভাবনার কথা হল মামা।"

মামা আমার দিকে চোখ বাঁকিয়ে বললেন, "তুই বড় দুষ্টু হয়েছিস ঝুলন? তোর কান যাবে।"

আমি বললুম, "কান যাবে কী করে?"

মামা বললেন, "আমার হাতে।"



আমি ভয় পাওয়ার ভান করে বললুম, "তা হলে তোমার হাতখানাকে তো আমার ভয় করা উচিত, কিন্তু ভাগনের কান যে ধরতে নেই মামা !"

মামা হেসে বললেন, "ধ্যাত ! বাদ দে সেসব। তোকে নিয়ে আর পারিনে। থাক এখন, ভূধরের বাড়ির দিকে একপাক ঘুরে আসিগে।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, ঘুরে এসো।"

মামা কেমন সাহসী লোক সে আমার অজানা নয়। বেজি দেখলে চমকে ওঠেন। শেয়াল আসতে পারে বলে রাতেও ভয়ে-ভয়ে বাইরে বেরোন। মামার বাঘ শিকারের কথা শুনেছিলুম। রাখাল দাস মামা বলেছিলেন রাতে বাঘের গর্জন শুনে গোকুলমামা ভেউ-ভেউ করে কেঁদেছিলেন। শেষরাতে রাখাল দাসের গুলিতেই বাঘ মরলে মামা ভয়ে মরা বাঘটার দিকে যাননি। তাঁকে দেখে হেসে হেসে রাখাল দাস যখন বাঘটার ওপর বসলেন তখন সাহস পেয়ে মামা বাঘটার গায়ে একটা পা তুলে দিয়ে বীরত্ব দেখালেন। মনে করলুম একদিন মামার দম বের করে দেব। বন্ধু পরেশের কাছে এই বিষয় আলোচনা করলুম। আমরা দু'জনে মিলে মামাকে একদিন রাম ঠকান ঠকাব ঠিক করলুম।

মামা আমাকে বাঘের ঘটনা বলার তিনদিনের পরের কথা। সেদিন সন্ধে হয়-হয়। মামা গিয়েছিলেন ওপারের গাঁয়ে। সন্ধের পর আমাদের বাড়ি ফিরে আসার কথা। ঘরে ফেরার আগে তাঁকে জব্দ করব বলে ঠিক করলুম। এই ভেবে আমি একটা মাটির কলসি জোগাড় করলুম। যে-পথে মামা আসবেন সে-পথের ধারে অল্প ঝোপ আছে। সেই পথে মানুষের বেশি আসা-যাওয়া নেই। তাই বলে ঝোপটায় বাঘ ভালুক বা অন্য কোনও জীব থাকে না। আমাদের ঘরের দক্ষিণ দিকে সেই ঝোপ। আমরা দু'জন সন্ধে হওয়ার আগেই সেই ছড়িয়ে থাকা বনের আড়ালে লুকিয়ে রইলুম। দেখতে-দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। মামা সেই পথে আসবেন ধরে নিয়ে লুকিয়ে রইলুম। আমার মনের আশা পূরণ হল। দেখলুম মামা আসছেন। একটু ভয় পেয়েছিলেন মনে হয়। তিনি একটা গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে আসছিলেন। দেখতে-দেখতে আমার দিকে এলেন। ভাবলুম আরও দু' গজ যান। মামা হনহনিয়ে আসছেন। আমাকে ফেলে একটু এগিয়ে গেলেন। তখনই আমি কলসিটা মুখে দিয়ে বাঘের মতো গলা করে চেঁচিয়ে উঠলুম। সেই শব্দকে বাঘের গর্জন ভেবে মামা 'আই ঔ ! বাঘে খেল ঔ !' বলে বনবাদাড় ভেঙে দিলেন দৌড় ! মামা একটা জায়গায় করে দুধ আনছিলেন। সেই দুধটা মাটিতে পড়ে গেল। তিনি প্রাণের ভয়ে দৌড়ে একেবারে আমাদের নালার মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আমিও দুধের জায়গাটা হাতে নিয়ে প্রায় মামার পেছনে-পেছনে দৌড়ে এসে হাজির হলুম। মামার মুখ ভয়ে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। ঠক-ঠক করে কাঁপছেন তিনি। আমাকে আর পরেশকে দেখে কী একটা বলবেন বলেও কথা খুঁজে পেলেন না। কেবল ফোঁফাচ্ছেন। আমরা মুচকি হেসে



তাঁর দুধের জায়গাটা তাঁকে দিয়ে যেই আমি কলসিটা মুখে নিয়ে হোঁকর-হোঁকর করে হাঁক দিলুম, ততক্ষণে তিনি আমাদের দুষ্টুমির কথা বুঝতে পারলেন। তারপর আমাদের দু'জনের দিকে একবার চাইলেন, যেন তাঁর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই দুই চোখের আগুনে আমাদের দু'জনকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। তারপর বললেন, "বদমাশ, কিছু কাজ পেলি না ? এরকম অকাজ করে বেড়াচ্ছিস ?" বলে একটা গাছের ডাল সজোরে মাটিতে আছড়ে মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে গেলেন। এই ঘটনার জন্য মামা তিনদিন আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি।

আমার পড়াশোনায় কোনওরকম অবহেলা দেখলে মামা আমায় আনেক বুঝিয়ে মনে উৎসাহ জোগান। আমাকে উৎসাহ দেওয়া মানে তাঁর নিজের গুণের কথা জাহির করা। তিনি এই স্কুলের একজন খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। শতকরা আশির কমে কোনও বিষয়ে নম্বর পাননি। এইসব কথা নিয়ে মাঝে-মাঝে তিনি বড় বেশি গৌরব করেন।

একদিনের কথা। আমি বাবার বইয়ের মাঝখানে যত্ন করে রাখা স্কুলের পরীক্ষার নম্বর লেখা খুব পুরনো একটা কাগজ পেয়ে তাড়াতাড়ি এনে পড়তে শুরু করেছি। মামা সামনে হাজির। তিনি বললেন, "প্রোগ্রেস রিপোর্ট নাকি ঝুলন ?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

মামা বললেন, "অ তুই তোর পরীক্ষার খবর তো দিলিই না ! পড়, কোন বিষয়ে কী নম্বর পেলি, শোনা যাক। যা মগজ তোর ! সরস্বতী ভয়ে না পালালেই রক্ষে। পড়, পড়ে যা।"

আমি পড়তে লাগলুম, "ইংরেজি প্রথম পত্র ১০০র ভেতরে-২৭, দ্বিতীয় পত্র—২৩, মোট ৫০।"

মামা বললেন, "গবেট । এত কম নম্বর পেয়েছিস ? ইস ! নাম ডোবালি। হ্যাঁ, বাকিগুলো কীরকম ?"

আমি আবার পড়লুম, "ভূগোল—২১. অসমিয়া প্রথম পত্র—২১, দ্বিতীয় পত্র—২৫, মোট ২০০র ভেতরে—৪৬. ইতিহাস—২৩, আর সংস্কৃত ১০০র ভেতরে—১৩।"

মামা মুখ ভেটকে বললেন, "ও, ফেল করেছিস। হায় ! আমায় দ্যাখ, এইসবে শতকরা ৮০ নম্বরের কম পাওয়া ভাবতেই পারি না। তোর নম্বর দেখলে হাসিও পায়, দুঃখ হয়।" তারপরে একটু নরম সুরে বললেন, "সে যা হোক, এটা হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা। এর মধ্যে ফেলের কোনও কথাই নেই। বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য ভাল করে পড়। না হলে ফেল করবি। বুঝেছিস ?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ বুঝেছি। কানে ঢুকছে মামা।"

মামা বললেন, "কী বুঝেছিস ? তোর মাথা আর মুন্ডু।"

আমি বললুম, "আমি *ঠিকই* বুঝেছি, মামা।"

মামা বললেন, "তা হলে বল, আমার কথার মধ্যে এইটে বুঝলি না যে, আমার মতো নম্বর পেতে হলে সাধকের সাধনার মতো তোকেও একমনে পড়াশোনা করতে হবে।"

আমি বললুম, "তোমার মতো নম্বর পেলে আমি নির্ঘাত ফেল করব, মামা।"

মামা বললেন, "কেন রে ?"

আমি বললুম, "এটা আমার নয়, তোমার প্রোগ্রেস রিপোর্ট, দ্যাখো । বাবার বইয়ের মধ্যে পেয়ে নিয়ে এলুম। এটাতে তোমার নাম লেখা। তাই না ?"

ভূতের ভয়ে চমকে-ওঠা মানুষের মতো মামা কাগজটা একবার দেখলেন। নিজের নাম দেখে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। তারপর, "তুই বড়ো তালেবর হয়েছিস ঝুলন !" বলে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিনের পর মামাকে আর বড় কথা বলতে শুনিনি। বিশেষ করে আমার সামনে।

ছবি : দেবাশিস দেব

বর্তমান অসমিয়া সাহিত্যে অনন্তদেব শর্মা উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু শিশু-সাহিত্যেই নয়, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। 'রঙা বর্দ আনে[illegible] বল' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ ভারত সরকারের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।